বাংলাদেশ হতে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন ২০১৩: অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ

ডঃ তাসনিম সিদ্দিকী
মোঃ সেলিম রেজা

রামরু
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮ ডিসেম্বর ২০১৩

বাংলাদেশ হতে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন ২০১৩: অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ

ডঃ তাসনিম সিদ্দিকী এবং মোঃ সেলিম রেজা
রামরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের মধ্যে আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়নে যে তিনটি খাত বিশেষভাবে অবদান রেখেছে তার মধ্যে শ্রম অভিবাসন অন্যতম। পুরুষ ও মহিলা অভিবাসী কর্মীরা শুধু রেমিটেন্স প্ররন করেই দেশের অর্থনীততে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখে চলেছে তা নয়, তারা দেশে জ্ঞান,দক্ষতা ও প্রযুক্তির স্থানান্তর ঘটাচেছ। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, কৃষি ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, উচ্চ ফলনশীল বীজ, কীটনাশক ও পর্যাপ্ত সেচ তথা কৃষি আধুনিকায়নে অভিবাসী কর্মী ও তাদেও পরিবারবর্গ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এসব পরিবার অর্থকারী ফসল উৎপাদন,মৎস্য চাষ ও খামার ব্যস্থাপনার মাধ্যমে গ্রাম অর্থনীতিকে সচল রাখতে সাহায্য করছে। তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি গ্রাম পর্যায়ে বাজার ব্যবস্থায় প্রভাব রেখেছে। এছাড়াও আমাদের সকলের জানা যে, বিগত নয় বছর ধরে শুধুমাত্র নিয়মিত রেমিটেন্স প্রবাহের কারনে বাংলাদেশ উদ্বৃত্ত ব্যালেন্স অব পেমেন্ট-এর দেশ হিসেবে অবস্থান বজায় রাখতে পেরেছে। ২০০০ সাল থেকে সুশীল সমাজের দাবির মুখে সরকারগুলো অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। ২০১৩ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপসমূহ হল:- বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০০৬ সংস্কার, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী কল্যাণ আইন ২০১৩ প্রনয়ন ও অনলাইন নিবন্ধন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ। এই রিপোর্ট ২০১৩ সালে সরকার, প্রাইভেট সেক্টর এবং সিভিল সমাজের অভিবাসন খাতে অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেছে।

১. বাংলাদেশ হতে আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন ২০১৩

১.১ পরিসংখ্যান

বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসন সর্বোচ্চ ঘটেছিল ২০০৮ সালে। ঐ বছর আট লক্ষের উপর স্বল্পমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক কর্মী কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেন। ২০০৯ এবং ২০১০ সালে বৈশ্বিক মন্দার কারনে তা অনেকটাই হ্রাস পেয়ে প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। পরবর্তী দুই বছর অর্থ্যাৎ ২০১১ এবং ২০১২ সালে বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিছুটা বাড়তে থাকে। ২০১২ সালে মোট অভিবাসীর সংখ্যা ছিল ৬,০৭,৭৯৮। ২০১৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অভিবাসন করেছেন ৪,০৩,৭৯৩ জন। অর্থাৎ ২০১৩ সাল অভিবাসী কর্মী প্রেরনের জন্য একটি খারাপ বছর। বিএমইটি'র তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৬ সাল হতে এ বছরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সর্বমোট ৮৬ লক্ষ ৭৯ হাজার লোক কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেছেন। কিন্তু এর ভেতর হতে চুক্তির মেয়াদ শেষ করে কতজন ফিরে এসেছেন সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কোন র্কাযক্রম না থাকায় বর্তমানে কতজন বাংলাদেশী বিদেশে কর্মরত রয়েছেন তা জানার কোন উপায় নেই। তবে কোন অবস্থাতেই এটা ভেবে নেয়া ঠিক নয় যে, ৮৬ লক্ষ ৭৯ হাজার লোক যারা বিএমইটি'র ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশে গিয়েছেন তাদের সকলেই এখনো বিদেশে কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশ হতে বছরভিত্তিক অভিবাসনের চিত্র নিম্নের গ্রাফ হতে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ হতে নারী অভিবাসন সাম্প্রতিক একটি ধারা। ১৯৯৭ সাল হতে ২০০5 সালের বিএমইটি'র ডাটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, ঐ বছরগুলোতে মোট অভিবাসীর ১% এরও কম ছিলেন নারী অভিবাসী। ২০০৬ সালে অদক্ষ ও আধা-দক্ষ নারী কর্মীর উপর হতে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর হতে নারী অভিবাসী বাড়ছে। ২০১২ সালে ৩৭,৩০৪ জন নারী কর্মী চাকুরি নিয়ে বিদেশ গিয়েছেন। এ বছর ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ৫৫,৫৫৭ জন নারী কর্মী চাকুরী নিয়ে বিদেশ গিয়েছেন। সেই হিসেবে এ বছর ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত নারী অভিবাসন প্রবৃদ্ধির হার ৪৮.৯৩ ভাগ। এ বছর নারী অভিবাসীর সংখ্যা ছিল মোট প্রেরিত কর্মীর ১২.৬৪% যা গত বছর ছিল ৬.১৪% ।

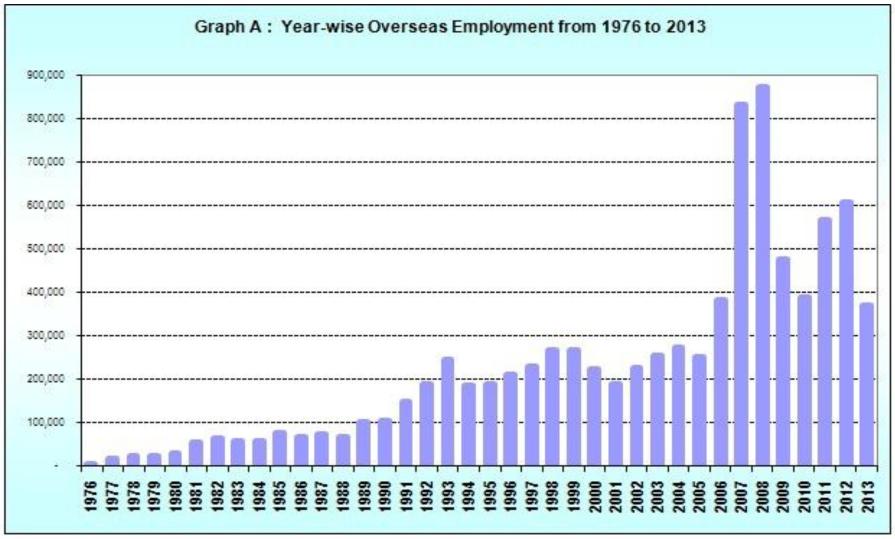

চিত্র: ১৯৭৬ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন

১.২ গন্তব্য দেশ

বাংলাদেশ থেকে বেশীরভাগ স্বল্পমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক কর্মী মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে অভিবাসন করেন । একই সাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতেও অভিবাসন করেন। ১৯৭৬ সাল হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত বছরগুলোতে শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসনের হার ছিল মোট অভিবাসনের ৫৮.১০ ভাগ থেকে ৯৭.৩০ ভাগ (সর্বনিম্ন ৫৮.১০ ভাগ ২০০৭ সালে এবং সর্বোচ্চ ৯৭.৩০ ভাগ ১৯৯১ সালে)। মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশ-সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার এবং বাহরাইন বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসীদের একটি বিরাট বাজার। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংযক্ত আরব আমিরাত সরকার বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক গ্রহনের বিষয়ে বিধি নিষেধ আরোপ করার পর থেকে দেশটিতে অভিবাসনের মাত্রা একেবারেই কমে এসেছে। এ বছর ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে মাত্র ১৩,৯৯৩ জন কর্মী অভিবাসন করেছেন যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৯৩.৫১ ভাগ কম। বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের শ্রমবাজার সৌদি আরবে পনঃপ্রবেশের ক্ষেত্রেও কোন অগ্রগতি ঘটেনি। এ বছর দেশটিতে মাত্র ১২,৬৪০ জন কর্মী অভিবাসন করেছেন যা গত বছরের তুলনায় ৪০.৪৭ ভাগ কম। এ বছর প্রেরিত মোট অভিবাসীর মাত্র ৩.৪৭ভাগ সংযক্ত আরব আমিরাতে এবং ৩.৩০ ভাগ সৌদি আরব গিয়েছেন যা গত বছরেও ছিল যথাক্রমে ৩৫.৪৫ ভাগ ও ৩.৪৯ ভাগ। ২০১৩ সালে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক কর্মী অভিবাসন করেছেন ওমানে। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩ সাল পর্যন্ত দেশটিতে ১,৩২,১৩১ জন কর্মী গিয়েছেন যা এ বছর মোট প্রেরিত কর্মীর ৩২.৭৩ ভাগ।

২০১৩ সালে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর। এ বছর সিঙ্গাপুরে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা ৫৯,৫১২ যা মোট প্রেরিত কর্মীর ১৪.৭৪ ভাগ। ৫৬,৮১৯ জন কর্মী গ্রহণ করে কাতার রয়েছে তৃতীয় স্থানে । এ বছর দেশটিতে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা মোট প্রেরিত কর্মীর ১৪.০৭ ভাগ। মালয়েশিয়াতে এ বছরে জি টু জি'র অধীনে মাত্র ১,০০০ জন কর্মী গিয়েছেন। কাতার নতুনভাবে কর্মী নিয়োগ করছে সে দেশের নির্মান খাতে।

গত বছরের মত এ বছরেও নারী অভিবাসী কর্মীদের সবচেয়ে বড় বাজার ছিল মধ্যপ্রাচ্য। ২০১৩ সালে নারী অভিবাসী কর্মীদের প্রধান গন্তব্য দেশ ছিল জর্ডান (৩৮.২২%) এবং তার পরে রয়েছে সংযক্ত আরব আমিরাত (২৩.৭৯%), লেবানন (১৯.৪৬%), ওমান (১০.৫৬%) এবং মরিশাস (২.৮৮%)। এছাড়া এ বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মী হংকং গিয়েছেন যাদের বেশীর ভাগ গৃহকর্মী।

এ বছর বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন বিশ্লেষনে আরেকটি ভাবনার দিক হল-রাজনৈতিকভাবে অস্থির দেশসমূহে (লেবানন,

লিবিয়া, মিশর, ইরাক, সুদান) শ্রম অভিবাসন। রাজনৈতিকভাবে অস্থির দেশসমূহে বাংলদেশের কর্মীদের নিরাপত্তার দিকটি এখনো খুব স্পষ্ট নয়। গন্তব্য দেশসমূহ পুরুষ ও মহিলা অভিবাসী কর্মীদের কর্ম পরিবেশ রামরু ও অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের জন্য উদ্বেগের বিষয় । এসব দেশে কিছু কিছু কোম্পানীতে কর্ম পরিবেশ মোটামুটি ভাল থাকলেও বেশিরভাগ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে কম বেতন, অনিয়মিত বেতন, চুক্তি ভঙ্গ, দীর্ঘ কর্মঘন্টা, ঝুঁকিপূর্ন কাজের পরিবেশ, নোংরা বাসস্থান, নারী কর্মীদের অনিরাপদ চলাচল এবং যৌথ দর কষাকষির অনুপস্থিতি রয়েছে। বাজার হারানোর ভয়ে বাংলাদেশ এসব সমস্যা সমাধানকল্পে এ বছরেও অন্যান্য উৎস দেশের মত জোরালো পদক্ষেপ গ্রহন করেনি। সাম্প্রতিকালে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এসব সমস্যা নিয়ে গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। অথচ বাংলাদেশ সরকার ও এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় অমলাতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার কারনে এসব সংস্থাকে অভিবাসীর অধিকার লংঘনের তথ্য না দিয়ে বরং এড়িয়ে চলেছে। গন্তব্য দেশগুলোতে বাংলাদেশী নারী কর্মীদের চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সবসময়ই একটি চিন্তার বিষয়। বিশেষ করে গার্মেন্টস বা কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকদের বেলায় অনিরাপদ চলাচল হতে উদ্ভুত সমস্যা লক্ষ্য করা গেছে।

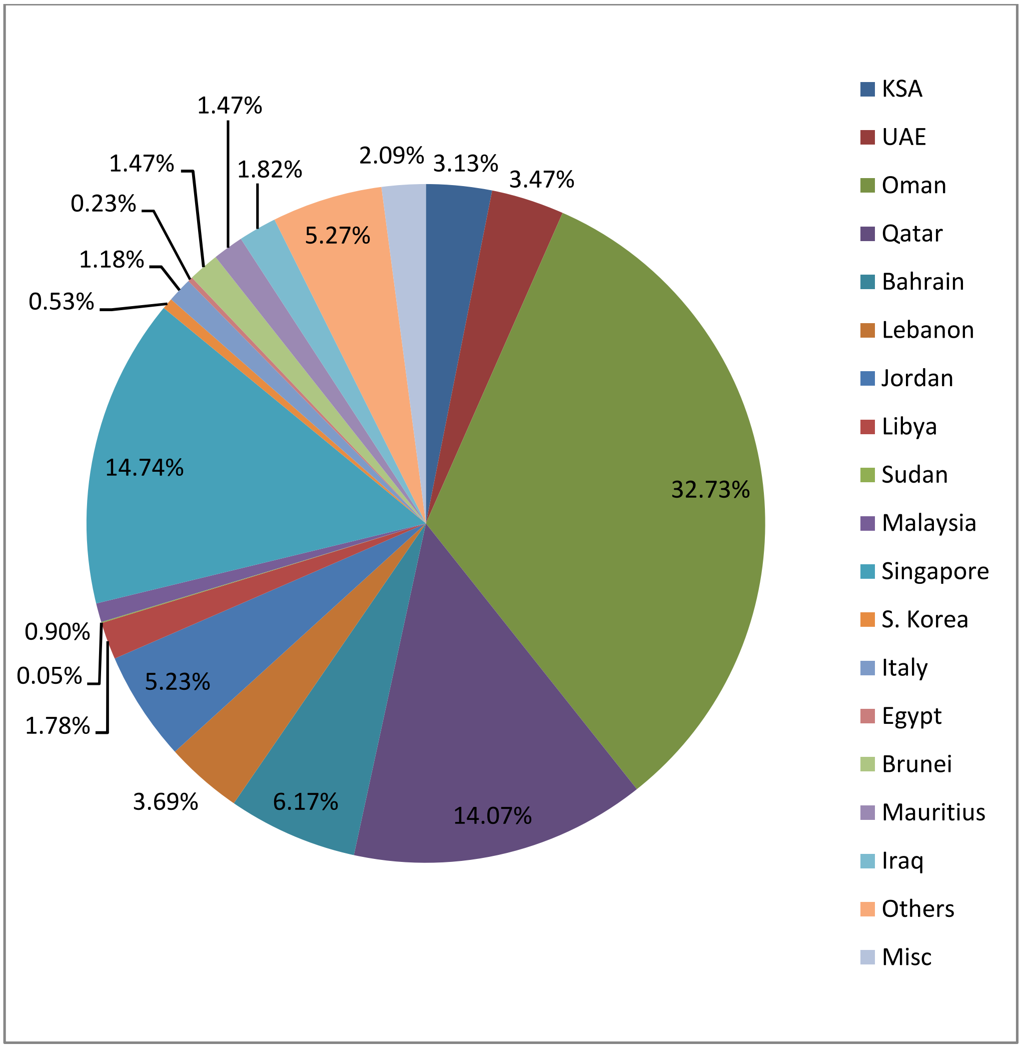

চিত্রঃ ২০১৩ সালে প্রেরিত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের গন্তব্য দেশসমূহ

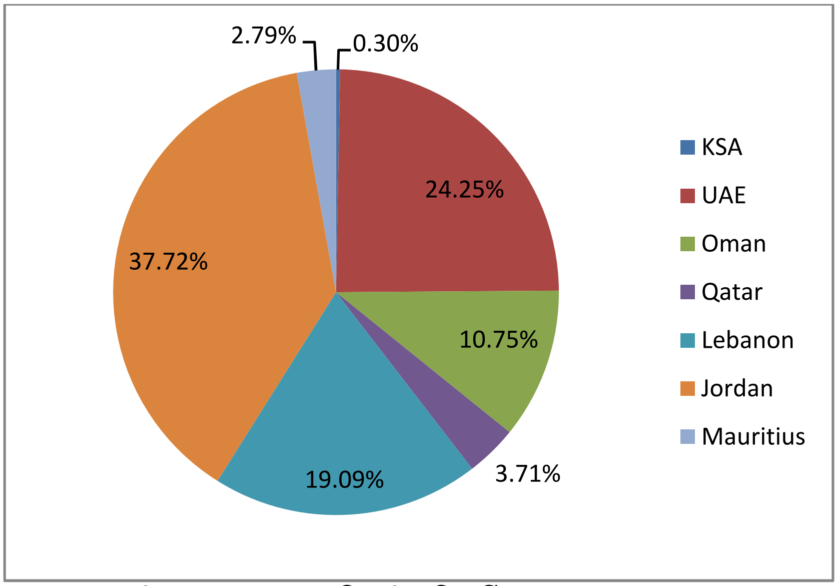

চিত্র: ২০১৩ সালে নারী অভিবাসী কর্মীদের গন্তব্য দেশসমূহ

১.৩ দক্ষতা

এ বছরেও বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসনে আরেকটি আশংকার দিক হল দক্ষ কর্মীর অভিবাসন হ্রাস পাওয়া। ২০১১ ও ২০১২ সালে দক্ষ কর্মীর সংখ্যা যথাক্রমে মোট কর্মীর ৪০.৩৪ ভাগ ও ৩৪.৪৫ ভাগে নেমে আসে। এ বছর দক্ষ কর্মীর সংখ্যা আরো নেমে এসেছে। এ বছর যারা বিদেশ গিয়েছেন তাদের মাত্র ১৯.৯৪ ভাগ হলেন দক্ষ কর্মী (নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত)। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে অংশগ্রহনকারী বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রাথমিক পর্যায়ে অদক্ষ বাজারে অংশগ্রহন করলেও তারা ক্রমশ দক্ষ বাজারে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। শ্রীলংকা ও ফিলিপাইন-এর অভিজ্ঞতা এখানে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বেলায় সেই ধরনের কোন পরিবর্তন আমরা এখনও লক্ষ করছি না। যদিও বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতির অন্যতম লক্ষ্য দক্ষ অভিবাসন বৃদ্ধি করা, তথাপি এখনো পর্যন্ত সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না।

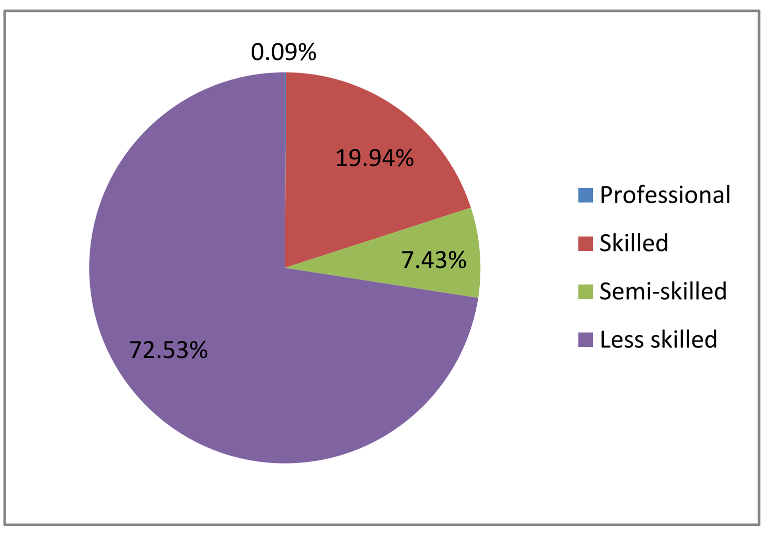

চিত্র: ২০১৩ সালে প্রেরিত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা

১.৪ উৎস এলাকা

অভিবাসীদের মূল উৎস এলাকা হিসেবে এ বছর প্রথম অবস্থানে রয়েছে কুমিল্লা (১১.৩৭%)। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম (৮.৬৯%)। কুমিল্লা ও চট্টগ্রামসহ ব্রাক্ষনবাড়িয়া (৫.২৪%), টাংগাইল (৪.৮৮%), চাঁদপুর (৪.৩৫%), ঢাকা (৪.২৩%), নোয়াখালী (৩.৯২%), মুন্সিগঞ্জ (৩.১১%) ও ফেনী (২.৪৯%) ছিল এ বছরে অভিবাসী কর্মীদের প্রধান ১০টি উৎস এলাকা। অন্যান্য বছরের মত এবারও উত্তরবঙ্গ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী অভিবাসন করেননি। এ অঞ্চল থেকে আন্তর্জাতিক অভিবাসন বাড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবে তার কোন প্রভাব পড়েনি। ২০১৩ সালে নওগাঁ থেকে অভিবাসন করেছেন ২,৭৯৮ (০.৭১%), নাটোর ১,৯৮৩ জন (০.৫০%), কুড়িগ্রাম থেকে ১,৯৮ জন (০.২৮%), নীলফামারি থেকে ৮৭৩ জন (০.৩৪%), গাইবান্ধা থেকে ১,৪৯৬ (০.৩৮%) এবং রংপুর থেকে মাত্র ১,২১৩ জন (০.৩১%)। নিচের গ্রাফ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দারিদ্র পীড়িত রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ হতে শ্রম অভিবাসন হয়েছে সবচেয়ে কম। পরিকল্পনা কমিশন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী যেসব এলাকায় অভিবাসন বাড়ছে সে সব এলাকায় দরিদ্র লোকের সংখ্যা কমছে। তাহলে দারিদ্র পীড়িত এলাকাগুলোতে অভিবাসনকে উৎসাহিত করতে কেন কোন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে না তা খতিয়ে দেখার বিষয়।

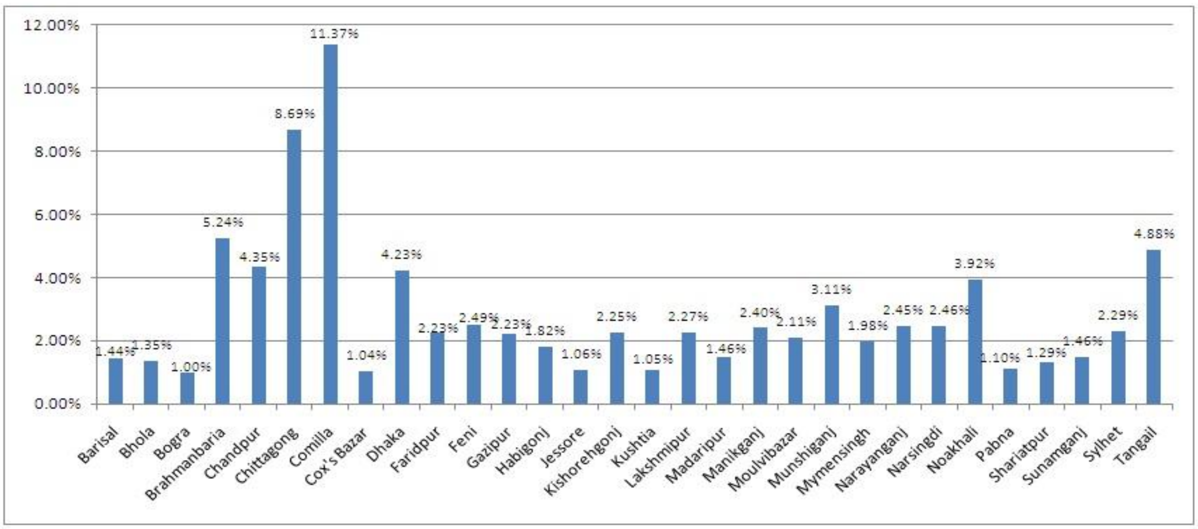

চিত্র: ২০১৩ সালে প্রেরিত বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের উৎস এলাকা

১.৫ প্রত্যাবর্তিত কর্মী

সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় এ বছর কতজন অভিবাসী কাজ শেষ করে না করে দেশে ফিওে এসেছে তার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি। তবে ২০১৩ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত ১৯,৭৪৯ জন কর্মী আউটপাস নিয়ে দেশে ডিপোর্টেড হয়েছেন। তথ্যের অভাবে বিদেশ ফেরত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে সরকারী বা বেসরকারী কোন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না । এসব কর্মীদের কোন জব পোর্টাল না থাকায় তাদের অর্জিত দক্ষতা দেশে কাজে লাগানো যাচ্ছে না ।

১.৬ রেমিটেন্স

দীর্ঘ দিন ধরে রেমিটেন্স বৃদ্ধির সূচক অত্যন্ত ইতিবাচক থাকলেও এ বছর প্রথম বারের মত রেমিটেন্সে আমরা ঋণাত্মক স্রোত দেখতে পেলাম। ২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান রেমিটেন্স বাংলাদেশে এসেছে। এ বছরের পূর্ববর্তী মাসগুলোর রেমিটেন্স প্রবাহের ধারা একই রকম থাকলে ২০১৩ সালে মোট রেমিটেন্সের পরিমান দাঁড়াবে প্রায় ১৩.৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। এটি গত বছরের তুলনায় প্রায় ২.৭৬% কম। ২০১০ সাল হতে কর্মী

প্রেরনে যে নীম্নমুখি প্রবনতা তারই সামগ্রিক ফলাফল আমরা রেমিটেন্স প্রবাহের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। গত বছরের মত এ বছরও নভেম্বর মাস পর্যন্ত র্সবাধিক রেমিটেন্স প্রদানকারী দেশ সৌদি আরব (২৩.৯১%), সংযক্ত আরব আমিরাত দ্বিতীয় স্থানে (১৯.২২%), এবং মার্কিন যক্তরাষ্ট্র তৃতীয় স্থানে (১৪.৮৩%) রয়েছে। এর পরে কুয়েত (৮.২১%) মালয়েশিয়া (৭.২২%) ও যক্তরাজ্য (৬.৫৯%) থেকে রেমিটেন্স এসেছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর মালয়েশিয়া থেকে আনুষ্ঠানিক পথে রেমিটেন্স প্রেরনের হার বেড়েছে।

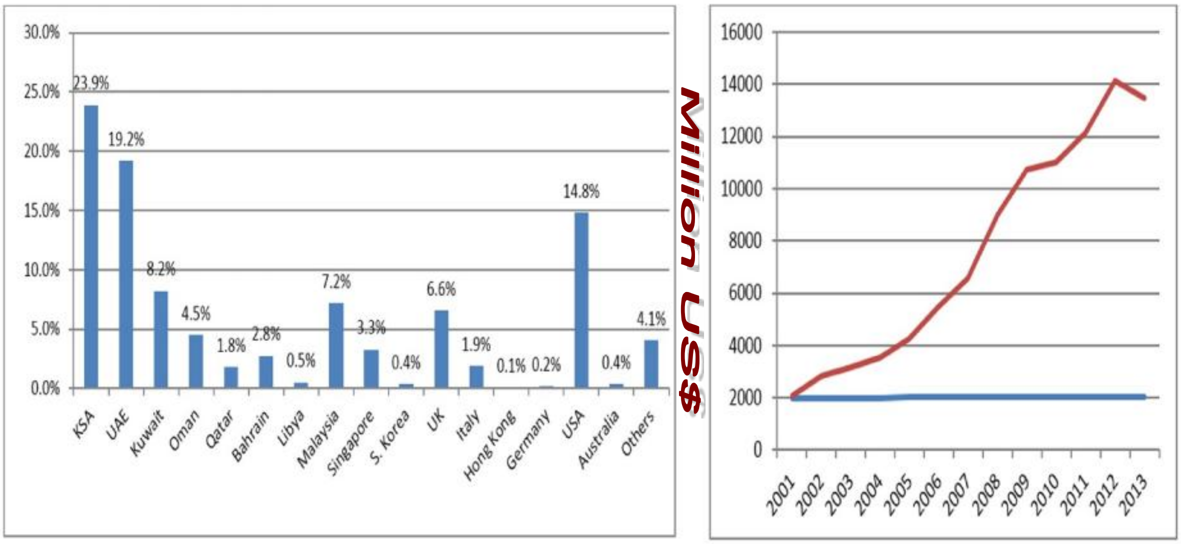

চিত্র: ২০১৩ সালের রেমিটেন্স প্রবাহ

১.৭ অভিযোগ

প্রতারিত অভিবাসীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিএমইটি দুইভাবে অভিযোগ গ্রহন করে থাকে: অনলাইন ও সরেজমিন। রামরু'র কারিগরি সহযোগিতায় বিএমইটি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইন অভিযোগ ব্যবস্থা চাল করে এবং চাল হওয়ার পর থেকে এ বছর ২৪ নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত অনলাইনে সর্বমোট ৫২০টি অভিযোগ জমা পড়েছে যার মধ্যে ৩০৯ টি তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, ২০৬ টি তে শুনানী হয়েছে এবং ৫ টি তে তদন্ত চলমান রয়েছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারী থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ২০ টি অভিযোগ জমা পড়েছে যার মধ্যে ৭ টিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, ৮টি তে শুনানী হয়েছে এবং ৫ টিতে তদন্ত চলমান। যে ৭টি অভিযোগে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে ৪ টিতে মোট ১,১৫,০০০/= টাকা ফেরত পেয়েছে অভিযোগকারী। বাকী ৩ টি তে বাদী পক্ষ অনুপস্থিত থাকায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। অভিযোগের সংখ্যা হতে এটি প্রতিয়মান হয় যে, অভিবাসন খাতে যে পরিমান প্রতারনা ঘটে তার খুব সামান্য অংশ সালিশের জন্য আসে।

২. অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ন ঘটনাবলী: ২০১৩

২.১ সরকারি পর্যায়ে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ

২০১২ সালের ২৬ নভেম্বর মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে কর্মী প্রেরণ ও গ্রহনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। অভিবাসনের উচ্চ ব্যয় হ্রাস এবং মালয়েশিয়া সরকারের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার Government to Government (G2G) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ নেয়। সরকারের এই উদ্যোগকে সিভিল সমাজের বিভিন্ন অংশসহ অনেকেই একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মালয়েশিয়ার সাথে ২০০৭ সালের সমঝোতা চুক্তির অভিজ্ঞতার আলোকে আশা করা হয়েছিল যে, পরবর্তী দুই থেকে তিন বছরে আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে মালয়েশিায় (The Daily Star, The Dhaka Tribune)। কিন্তু G2G ব্যবস্থার কাঠামোগত ও অন্যান্য জটিলতার কারনে

গত এক বছরে মাত্র ১,০০০ কর্মী প্রেরন করা সম্ভব হয়েছে। মালয়েশিয়ার বিভিন্ন নিয়োগকর্তা, আউটসোর্সিং কোম্পানী, বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাথে আলোচনা হতে রামরু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে G2G কার্যকর করতে হলে মালয়েশিয়ায় নিয়োগকর্তাদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের অনলাইনে চাহিদা পত্রের মাধ্যমে লোক সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করতে প্রাইভেট সেক্টরের মার্কেটিং স্কিল সম্পন্ন মালয়েশিয়ান তরুন কর্মী নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া ছবিতে পিক্সেলের Specification, ফিংগার প্রিন্টিং ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট নজরদারী প্রয়োজন ছিল। নিয়োগকর্তাদের সাথে আলোচনা হতে জানা যায় যে, খসখসে হাত এবং পোড়া চামড়ার গ্রামীন খেটে খাওয়া মানুষকে চেয়েছিল তারা । প্লানটেশন অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং এই কাজে তারা শিক্ষিত ও কঠোর পরিশ্রমে অনভ্যস্ত কর্মী নিতে অনাগ্রহী। G2G কে সার্থক করতে হলে আজকের এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে দীর্ঘ সময় বাংলাদেশকে দিতে হবে সেই সময় বাংলাদেশের হাতে নেই। G2G-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বল্প সংখ্যার লোক পাঠাচ্ছে অথচ মালয়েশিয়ায় যে শ্রমিক চাহিদা তা প্ররন হয়ে যাচ্ছে মায়ানমার ও নেপালের শ্রমিক দ্বারা। এই অবস্থায় মালয়েশিয়ার শ্রম বাজারে নিজের অবস্থান দৃঢ় করতে হলে এখনি সময় এসেছে G2G নীতির পূনর্মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের।

২.২ অনিয়মিত পথে অভিবাসন

বাংলাদেশ হতে অনিয়মিত অভিবাসন একটি বড় সমস্যা। টেকনাফ থেকে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া গমন, ইরান, লিবিয়া,মরক্কো এবং তিউনিশিয়া হয়ে ইউরোপ ঢোকার চেষ্টা এসব খবর বছর জুড়ে পত্র-পত্রিকায় উঠে এসেছে। অনিয়মিত অভিবাসনে একজন অভিবাসী অধিক ঝুঁকি নিয়ে বিদেশ গমনে ইচ্ছুক হন এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রতারনা, ধোঁকাবাজি, অন্যায় জুলম এবং মৃত্যুর মুখে পতিত হন । এ বছর সৌদি আরব ও মালয়েশিয়া থেকে অনেক বাংলাদেশী কর্মীকে জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো হয়েছে। অনেকেই গন্তব্য দেশে জেল বা আটক শিবিরে আটক পড়ে আছেন। সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া পাঠাতে তৎপর সংঘবদ্ধ চক্রটি মিডিয়া ও পত্র-পত্রিকায় চিহ্নিত হলেও সরকার এখানো পর্যন্ত এ ধরনের অবৈধ নিয়োগকারীদের বিরুদ্ধে কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহন করেনি।

২.৩ উচ্চ অভিবাসন ব্যয়

২০১৩ সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর পর্যন্ত রামরু ৬টি জেলাতে “Impact of migration on poverty” শিরোনামে গবেষনার মাঠ পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত করে। এটি রামরু এবং সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি যৌথ গবেষনা। এই গবেষনায় দেখা যায় যে, যারা এ বছরে সৌদি আরবে অভিবাসন করেছেন তারা ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা অভিবাসন খরচ হিসেবে ব্যয় করছেন এবং যারা কাতারে যাচ্ছেন তারা ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। মালয়েশিয়াতে G to G’র মাধ্যমে মাত্র ১,০০০ কর্মী গেলেও প্রতি দিন, ছাত্র ভিসা, Tourist Visa নিয়ে বহু সংখ্যক কর্মী মালয়েশিয়াতে যাচ্ছেন। এদের খরচ পড়ছে ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা। সরকারের অভিবাসন ব্যায়হ্রাসের কার্যক্রমের বাস্তব কোন কার্যকারিতা দেখা যাচ্ছে না।

২.৪ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন

সরকার ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় প্লান্টেশন সেক্টরে কাজ করার জন্য দেশব্যাপী অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের আহবান জানায়। এ প্রক্রিয়ায় ১৪ লক্ষ লোক রেজিস্ট্রেশন করে। এই ডাটাবেজ হতে এ পর্যন্ত মাত্র ১,০০০ লোক মালয়েশিয়া যায়। গত ২২ সেপ্টেম্বর সরকার পুনরায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের আহবান জানায়। ঢাকা ও বরিশাল বিভাগে ২,০৪,০০০ লোক নাম নিবন্ধন করে। চাকুরির চাহিদাপত্র ছাড়াই এই রেজিস্ট্রেশনের কারনটি সকলের কাছে এখনও অস্পষ্ট।

৩. আইনগত ও প্রতিষ্ঠানিক পরিবর্তন

৩.১ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী কল্যান আইন ২০১৩

অভিবাসন ক্ষেত্রে ২০১৩ সালে সরকারের সবচেয়ে বড় অর্জন বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী কল্যাণ আইন-২০১৩ প্রবর্তন। দীর্ঘদিন ধরে আইনটি বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় এবং এ বছর ২৩ অক্টোবর জাতীয় সংসদে কণ্ঠ ভোটে পাশ হয়। আইনটি ৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ৪৯টি ধারা সম্বলিত। প্রথমবারের মত এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা দায়ের করার অধিকার এবং ক্ষতিপূরন আদায়ে দেওয়ানী মামলা দায়ের করার অধিকার অভিবাসী ও তার পরিবারকে প্রদান করা হয় । এটি অভিবাসীদের একটি বিরাট প্রাপ্তি । তবে এই আইনের মুখবন্ধ ১৯৯০ এর অভিবাসন বিষয়ক UN Convention কে আমলে নিলেও ILO-এর কনভেনেশন নম্বর ৯৭ (সংশোধিত ১৯৪৯), সুপারিশ নম্বর ৮৬ (সংশোধিত ১৯৪৯), নিগ্রহমূলক অবস্থায় অভিবাসন কনভেনেশন ১৪৩ এবং অভিবাসনদের প্রতি সম-সুযোগ ও আচরন সংক্রান্ত দলিল-১৯৭৫ বর্ণিত অধিকারগুলো সিভিল সমাজের উপর্যোপরি দাবীর পরেও উল্লেখ করা হতে সরকার বিরত থেকেছে। অভিবাসী কর্মীর অধিকার আদায়ে এইসব কনভেনেশন বর্ণিত অধিকারসমূহকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী কল্যাণ আইন-২০১৩ তে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল।

৪. অভিবাসীদের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমসমূহ

৪.১ ওয়েজ আনার্স কল্যান তহবিল

বহির্গামী অভিবাসী কর্মীদের নিকট হতে সংগৃহীত কল্যাণ চাঁদা, মিশন সমূহে গৃহীত কনস্যুলার ফি'র উপর ১০% হারে সারচার্জ, দূতাবাস কর্তৃক চাকুরীর কাগজপত্র সত্যায়ন ফি ইত্যাদি বাবদ সংগৃহীত টাকা নিয়ে ১৯৯০ সালে সৃষ্টি করা হয় ওয়েজ অর্নার্স কল্যাণ তহবিল। শুরুতে অভিবাসী কর্মীর নিকট হতে কল্যাণ ফি বাবদ ১০০ টাকা গ্রহন করা হত যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায় ১,০০০ হতে ১,৩০০ টাকা পর্যন্ত। ২০১৩ সালে কোন যুক্তিসংগত কারন ছাড়াই একে বাড়িয়ে অভিবাসীদের থেকে নেয়া চাঁদার পরিমান প্রায় দ্বিগুন করে Non-attested Visa'র জন্য ২,০০০ টাকা এবং Embassy Attested Visa'র জন্য ২,৫০০ টাকা করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত শ্রমিকদের ফি হতে যে বিশাল তহবিল তৈরী হয়েছে তা সরাসরি শ্রমিকদের কল্যাণে খুব কমই ব্যয় হয়। অভিবাসী কর্মীর চাঁদা ১,১৫০ টাকা ধরে অংক করলে দেখা যায় যে, ২০০৫ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সত্যায়ন, কনস্যুলার ফি ইত্যাদি হতে আয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অভিবাসী কর্মীর চাঁদা হতে বিএমইটি সংগ্রহ করেছে প্রায় ৫৫০ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ২০০৫ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৩৭ কোটি ১২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা লাশ সৎকার বাবদ এবং ৪৯ কোটি ৩১ লক্ষ ১১ হাজার ৮১৪ টাকা মৃত অভিবাসীর স্বজনদের প্রদান করা হয়েছে। এটিকে অভিবাসীদের সরাসরি সেবা হিসেবে ধরা যেতে পারে। এর বাইরে এই তহবিল মূলত ব্যবহৃত হয়েছে এমন সব কাজে যার অর্থের যোগান হওয়া উচিত ছিল রাষ্ট্রের রাজস্ব বাজেট হতে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সৃষ্টি, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের ভবন তৈরী, বিএমইটি'র প্রশিক্ষণ ভবন তৈরী, লেবার এট্যাশে বা ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগসহ নতুন বাজার খোঁজার যৌক্তিকতায় বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক সফর বাবদ এই টাকা ব্যবহৃত হচ্ছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের এহেন ব্যবহার অনৈতিক এবং দ্রুত এই তহবিলের ব্যবহারবিধি পরিবর্তন করে অভিবাসীকে সরাসরি সেবাদানে খরচ করার দাবী জানাচ্ছি।

৪.২ রিক্রুটিং এজেন্সি

সিভিল সমাজ এবং মিডিয়া দীর্ঘ দিন ধরে অভিবাসী সংগ্রহ ও প্রেরনের ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সিদের দায়বদ্ধতার অভাবকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছে। অধিক আভিবাসন ব্যায়, এক কাজের নামে অন্য কাজে প্রেরন, বেতন না দেওয়া, চুক্তি পূনস্থাপন সহ বিভিন্ন ভাবে কর্মীরা প্রতারিত হয়েছে এবং দালাল, ট্রাভেল এজেন্টসহ লাইসেন্সধারী রিক্রুটিং এজেন্সির একাংশ সকলেই কম বেশি এই সব কর্মের সাথে যুক্ত বলে সরকারের কাছে তুলে ধরা হয়েছে । গত ২ বছর ধরে সরকার এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের দায়বদ্ধ করতে আইন প্রনয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। নিজেই বিভিন্ন দেশের সাথে G2G করে লোক প্রেরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

বিএমইটি'র তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে লাইসেন্সধারী বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ৮৫২। ২০১২ সালে ৫২ টি এবং ২০১৩ সালে ৭ টি নতুন রিক্রুটিং এজেন্সি কে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। যেখানে সরকার রিক্রুটিং এজেন্সির কর্মপরিধি সীমিত করেছে সেক্ষেত্রে নতুন লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি সাধারন মানুষকে এটি ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে যে, এর সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিবিদদের স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ২০১৩ সালের রিক্রুটমেন্ট কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, সরকার বিভিন্ন দেশের সাথে G2G করে লোক

প্রেরনের চেষ্টা চালিয়েছে, নতুন বাজার খুলতে পারছেন না, অভিবাসন আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে উচ্চ অভিবাসন ব্যয় আরও উচ্চতর হচ্ছে। এই অবস্থায় রামরু মনে করে যে, সরকারের regulatory ভূমিকায় ফিরে যাওয়া প্রয়োজন এবং রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহকে দায়বদ্ধ করে লোক প্রেরনে সহায়তা প্রদান করা দরকার।

৪.৩ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

২০১১ সালের অক্টোবর মাসে ওয়েজ অর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে ৯৫ কোটি এবং সরকার হতে ৫ কোটি এভাবে মোট ১০০ কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাংকটিকে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর একটি ব্যাংকে পরিনত করার লক্ষ্য থাকলেও এর কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অস্বচ্ছতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিধি প্রনয়ন সমাপ্ত না করে প্রায় ২২টি শাখা খোলা হয়েছে এবং তাতে লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০১৩ সালে যে ৪ লক্ষ কর্মী বিদেশ গিয়েছেন তার ১,৫৬৭ জনকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ঋণ প্রদানে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যাবর্তীত অভিবাসীদের Enterprise সৃষ্টি উৎসাহিত করে এমন কোন সৃষ্টিমুখী প্রকল্প ব্যাংকটি হাতে নিতে পারেনি। এ বছরে মাত্র ৬০ জন প্রত্যাবর্তীত অভিবাসীকে ব্যাংকটি ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করতে পেরেছে।

৪.৪ মাঠ পর্যায়ে সরকারী কার্যক্রম: জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস

অভিবাসীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বি.এম.ই.টি'র অধীনে বাংলাদেশের ৪২টি জেলায় জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস (ডিইএমও) রয়েছে। ডিইএমও অফিসগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মূল্যায়ন করে দেখা যাচ্ছে যে, ৪২টি অফিসের ২০টিতেই কোন কর্মকর্তা নেই। সহকারীরাই কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। এসব অফিসে যত পদ রয়েছে তার ৫০ ভাগই শূন্য পড়ে রয়েছে। এদের প্রশিক্ষনও বিশেষভাবে হয় না। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দূর্বল এসব অফিস কোনভাবেই অভিবাসীদের সেবা দিতে পারছে না। ফলে বিকেন্দ্রীকরণও ঘটছে না।

৪.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বি.এম.ই.টি'র টিটিসি সমূহ

বি.এম.ই.টি'র অধিনে ৩৮ কারিগরী প্রশিক্ষন কেন্দ্র রয়েছে এবং ১০টি নির্মানাধীন কারিগরী প্রশিক্ষন কেন্দ্র চালু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। গত বছর সব মিলিয়ে প্রায় ৬৫,০০০ প্রশিক্ষনার্থী বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষন গ্রহন করেছিল। এ বছর নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৭৫,০০০ প্রশিক্ষনার্থী বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষন গ্রহন করেছে। প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলোতেও জনবল সংকট তীব্র আকার ধারন করেছে। ২০১৩ সালে নতুন কোন প্রশিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। অধিকন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষক অবসর গ্রহন করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠনে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে ইন্সট্রাক্টররাই প্রশিক্ষন কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করছেন। যদিও প্রতি বছর ২০,০০০ প্রশিক্ষনার্থীকে প্রশিক্ষন দেয়ার সামর্থ্য রয়েছে, এ সংখ্যার তিনগুন প্রশিক্ষনার্থী প্রতি বছর প্রশিক্ষন গ্রহন করছে। ২০১৩ সালে নতুন কোন ট্রেড বা কারিকুলাম চালু হয়নি। এ বছর পুরনো ট্রেডে জ্ঞান প্রদানের জন্যও কোন টিওটি প্রদান করা হয়নি। অধ্যক্ষসহ মোট ১০০ জন প্রশিক্ষককে বিশ্বব্যাংকের STEP প্রজেক্টের অধীনে প্রশাসনিক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়।

৪.৬ লেবার এট্যাশে

গন্তব্য দেশসমূহে অভিবাসীদের কাঙ্খিত সেবা পাবার ক্ষেত্রে বিবিধ জটিলতা রয়েছে । রামরু'র সাম্প্রতিক এক গবেষনায় দেখা গিয়েছে যে, ২০১৩ সালে অভিবাসীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের প্রায় ৮০% ছিল পাসপোর্ট নবায়ন সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রিতা, মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদানে অধিক বিলম্ব, অভিবাসী অবান্ধব স্থানে এম্বেসী স্থাপন, এম্বেসী তে পানিয় জলের সংকট, অপেক্ষার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট স্থান না থাকা, টয়লেট ব্যবস্থা প্রয়োজন অনুযায়ী না থাকা এবং একই কাজে অকারনে দ্বিতীয় তৃতীয় বার এম্বেসীতে আসা প্রসংগে। সাধারনভাবে এসব অভিযোগের সাথে লেবার এট্যাশেগনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। যদিও এসব সেবার অধিকাংশই পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের এখতিয়ারভক্ত। প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের কারনে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও লেবার

এট্যাশেগনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও যৌথ অংশিদারিত্বের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে এম্বেসী থেকে দ্রুততার সাথে কাঙ্খিত সেবা অভিবাসীরা পাচেছন না। লেবার এট্যাশেগন শুধুমাত্র শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব, অভিবাসীর মৃত্যু, ফেরত পাঠানো, জেলে আটককৃত বাংলাদেশী অভিবাসীদের সনাক্ত করা ইত্যাদি কাজে জড়িত। মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের কাজে পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় তাদেরকে যুক্ত করে না। ফলে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদানে লোকবল না থাকায় ব্যাপক সময় লাগে। ২০১৫ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে বাংলাদেশের সকল অভিবাসীকে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান না করলে প্রায় ৪৫ লক্ষ অভিবাসী ভ্রমনের ক্ষেত্রে তীব্র সংকটে পড়বেন।

৪.৭ অভিবাসন খাতে সুশীল সমাজের ভূমিকা

দীর্ঘদিন ধরে অভিবাসন খাতে সুশীল সমাজ গুরুত্বর্পূন ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৩ সালে WARBE DF,OKUP, BRAC এবং RMMRU একত্রে প্রায় ১০,০০০ জন অগ্রহী অভিবাসীকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন প্রদান করেছে। এছাড়াও এসব প্রতিষ্ঠান গ্রাম পর্যায়ে ৬৭৩ টি জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রমের আওতায় ৬,৩৮,৪৮৬ জন ব্যক্তিকে অভিবাসন বিষয়ে সচেতন করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে সালিশের মাধ্যমে মোট ১২৯ টি অভিযোগের মীমাংসা করে এসব প্রতিষ্ঠান প্রায় ৫৯ লক্ষ টাকা অভিবাসীকে ফিরে পেতে সাহায্য করেছে। গত বছর Migrants Forum in Asia (MFA)-এর সহায়তায় RMMRU, WARBEDF, ACD, Ain o Salish Kendro ঢাকায় 2nd UN High Level Dialogue-এর প্রাক্কালে একটি পরামর্শমূলক আলোচনার অয়োজন করেছিল। এ বছর ২০ এপ্রিল সে আলোচনার উপরে অরেকটি ফলো- আপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং এ আলোচনার বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক পরামর্শ নিউ ইয়োর্কে অনুষ্ঠিত UN High Level Dialogue-এ উপস্থাপন করা হয় ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী কল্যাণ আইন-২০১৩ এর প্রথম খসড়া প্রণয়ন করেছে রামরু। এ আইনের মুখবন্ধে ১৯৯০ কনভেনশনের উল্লেখ, সমতার নীতি প্রয়োগ, অভিবাসী ও তার পরিবারের দেওয়ানী ও ফৌজদারি আদালতে সরাসরি মামলা দায়েরের বিষয়গুলো রামরু লিখিত খসড়া হতে গৃহীত হয়েছে।

উপসংহার

এ বছর বাংলাদেশ হতে শ্রম অভিবাসন ও রেমিটেন্সের নেতিবাচক ধারার কারন খুঁজে বের করা খুব বেশি কঠিন নয়। দশ বছর মেয়াদী দীর্ঘ পরিকল্পনায় ও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভিবাসনকে একটি অতি গুরুত্বর্পূ খাত হিসেবে চিহ্নিত করে এ খাতে পর্যাপ্ত সম্পদ বন্টন করা হয়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের মাঝে পার্টনারশিপের মনভাব না থাকা নতুন শ্রমবাজার খোঁজার ক্ষেত্রে, কর্মীদের সেবা দানের ক্ষেত্রে এবং বৈশ্বিক অভিবাসন ফোরামগুলোতে যুক্তিযুক্ত অংশগ্রহনের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এ বছরে বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় তার সহযোগী সংস্থা বিএমইটি'তে যোগ্য সরকারী কর্মকর্তাদের ধরে রাখতে সফলতার প্রমান দিতে পারেনি। যেসব সরকারী কর্মকর্তা দীর্ঘদিন ধরে অভিবাসন বিষয়ে কাজ করে যোগ্যতা ও দক্ষতার ছাপ রেখেছেন তাদেরকে স্বপদে বহাল রাখা সম্ভব হয়নি।

রিক্রুটিং এজেন্সি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব অভিবাসন খাতের জন্য একটি অশুভ সংকেত। সরকারের উচিত রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো যাতে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপে অনুসরন করে সে ব্যাপারে কঠোর নজরদারি বাড়ানো। শ্রম অভিবাসন কমানোর লক্ষ্যে সকারের G2G উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে প্রশংসিত হলেও এতদিনে প্রমানিত হয়েছে যে, নিয়োগকর্তার নিকট থেকে চাকুরীর চুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই এখন সময় এসেছে সরকারের উচিত G2G নীতিকে পুনর্মূল্যয়ন করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা।

পরিশেষে, যে কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অতীব গুরুত্বপূর্ন। অভিবাসী তথা গোটা জাতির দূর্ভাগ্য যে, সরকার এবং বিরোধী দল প্রতিটি আমলেই একটি করে নতুন সাংবিধানিক সংকট তৈরী করে। তাদের সৃষ্ট

এসব রাজনৈতিক সংকট সাধারন মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অর্জনগুলোকে পিছনে ঠেলে দেয় । অভিবাসন সেক্টরও এই অপ্রয়োজনীয় সংকটগুলোকে পাশ কাটাতে পারে না । অভিবাসন সেক্টরের অর্জনকে সমুন্নত রাখতে আমরা সরকার এবং বিরোধী দলের দায়বদ্ধতা দাবি করছি এবং অনতিবিলম্বে এই অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।